

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(Book# 81) www.motaher21.net

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ

" আল্লাহর পথে জিহাদ কর যেভাবে জিহাদ করা উচিত।"

" Strive hard in Allah's Cause as you should."

সূরা: আল-হাজ্জ

আয়াত নং :-৭৮

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَلَّةً أَيْنَكُمُ إِبْرَاهِيمُ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَ فِي هَذَا لِيَكُونَ
الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَ تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ وَ اغْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَ نِعْمَ النَّصِيرُ

আল্লাহর পথে জিহাদ করো যেমন জিহাদ করলে তার হক আদায় হয়। তিনি নিজের কাজের জন্য তোমাদেরকে বাছাই করে নিয়েছেন এবং স্বীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোন সংকীর্ণতা আরোপ করেননি। তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও। আল্লাহ আগেও তোমাদের নাম রেখেছিলেন “মুসলিম” এবং এর (কুরআন) মধ্যেও (তোমাদের নাম এটিই) যাতে রসূল তোমাদের ওপর সাক্ষী হন এবং তোমরা সাক্ষী হও লোকদের ওপর। কাজেই নামায় কায়ম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাও। তিনি তোমাদের অভিভাবক, বড়ই ভালো অভিভাবক তিনি, বড়ই ভালো সাহায্যকারী তিনি।

৭৮ নং আয়াতের তাফসীর:

[১] مجاهدة و جهاد শব্দের অর্থ কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করা এবং তজ্জন্যে কষ্ট স্বীকার করা। [বাগভী]

কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও মুসলিমরা তাদের কথা, কর্ম ও সর্বপ্রকার সম্ভাব্য শক্তি ব্যয় করে। তাই এই যুদ্ধকেও জিহাদ বলা হয়। حَقُّ جِهَادِهِ ط এর অর্থ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য কাফেরদের বিরুদ্ধে সম্পদ, জিহা ও জান দিয়ে জিহাদ করা। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

অর্থাৎ তাতে জাগতিক নাম-যশ ও গনীমতের অর্থ লাভের লালসা না থাকা। কারও কারও মতে, حَقُّ جِهَادِهِ ط বা যথাযথ জিহাদ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহর যাবতীয় নির্দেশ মান্য করা, আর যাবতীয় নিষেধ পরিত্যাগ করা। অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্যে নিজেদের প্রবৃত্তির সাথে জিহাদ করা এবং নাকসকে প্রবৃত্তির দাসত্ব হতে ফিরিয়ে আনা। আর শয়তানের সাথে জিহাদ করবে তার কুমন্ত্রণা ঝেঁড়ে ফেলে দিয়ে, যালেমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে তাদের যুলুমের প্রতিরোধ করে এবং কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে তাদের কুফরিকে প্রতিহত করে। [কুরতুবী]

কারও কারও মতে, حَقُّ جِهَادِهِ ط এর অর্থ জিহাদে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে কর্ণপাত না করা। [ফাতহুল কাদীর]

দাহহাক ও মুকাতিল বলেন: حَقُّ جِهَادِهِ ط দ্বারা উদ্দেশ্য, আল্লাহর জন্য কাজ করা, যেমন করা উচিত এবং আল্লাহর ইবাদাত করা যেমন করা উচিত। আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক বলেন: এ স্থলে জিহাদ বলে নিজের প্রবৃত্তি ও অন্যান্য কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে জিহাদ করা বোঝানো হয়েছে। [বাগভী]

[২] ওয়াসিলা ইবনে আসকা' রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা সমগ্র বনী-ইসমাজলের মধ্য থেকে কেনানা গোত্রকে মনোনীত করেছেন, অতঃপর কেনানার মধ্য থেকে কুরাইশকে, অতঃপর কুরাইশের মধ্য থেকে বনী-হাশেমকে এবং বনী-হাশেমের মধ্য থেকে আমাকে মনোনীত করেছেন। [মুসলিম: ২২৭৬]

[৩] অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এ দ্বীনে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি। 'দ্বীনে সংকীর্ণতা নেই'-এই বাক্যের তাৎপর্য বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে, কোন কোন মুফাসসির বলেন, এর অর্থ: এই দ্বীনে এমন কোন গোনাহ নেই, যা তাওবা করলে মাফ হয় না এবং আখেরাতের আযাব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোন উপায় হতে পারে না। পূর্ববর্তী উম্মতদের অবস্থা এর বিপরীত। তাদের মধ্যে এমন কতিপয় গোনাহও ছিল, যা তাওবা করলেও মাফ হত না। [ফাতহুল কাদীর]

কারও কারও নিকট এর অর্থ, দ্বীনের মধ্যে এমন কোন হুকুম নেই যা মানুষকে সমস্যায় নিপতিত করবে। বরং এখানে যাবতীয় সংকীর্ণ অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় আছে। মূলতঃ ইসলাম সহজ দ্বীন, সুনির্দিষ্ট কোন দিক নয়; বরং সর্বদিক দিয়েই ইসলাম সহজ দ্বীন। এ দ্বীনে কোন সংকীর্ণতার অবকাশ নেই। আল্লাহ তা'আলা এ দ্বীন ইসলামকে কেয়ামত পর্যন্ত সর্বশেষ দ্বীন হিসাবে অবশিষ্ট রাখবেন। তাই সর্বসাধারণের উপযোগী করে তিনি এ দ্বীন নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ দ্বীনের মধ্যে সংকীর্ণতা না থাকার ব্যাপারে বিভিন্ন পুস্তক রচনা করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়- অযুর পানি না পেলে তায়াম্মুমের অনুমতি, যমীনের সমস্ত স্থান সালাতের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া, সফর অবস্থায় সালাতের কসর, সওমের জন্য অন্য সময়ে পূরণ করার অনুমতি ইত্যাদি অন্যতম। [দেখুন, ইবন কাসীর]

[৪] এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, তোমাদের পিতা বলে কাদের বোঝানো হয়েছে? কোন কোন মুফাসসির বলেনঃ এখানে প্রকৃতপক্ষে কুরাইশী মুমিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা সরাসরি ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম-এর বংশধর। [কুরতুবী]

এরপর কুরাইশদের অনুগামী হয়ে সব মুসলিম এই ফযীলতে शामिल হয়; যেমন-হাদীসে আছেঃ সব মানুষ দ্বীনের ক্ষেত্রে কুরাইশদের অনুগামী। মুসলিম মুসলিম কুরাইশদের অনুগামী এবং কাফের কাফের কুরাইশদের অনুগামী। [মুসনাদে আহমাদঃ ১৯, অনুরূপ হাদীস- বুখারীঃ ৩৪৯৫, মুসলিমঃ ১৮১৮, ইবনে হিব্বানঃ ৬২৬৪]

কারও কারও মতে, এ আয়াতে সব মুসলিমকে সম্বোধন করা হয়েছে। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এদিক দিয়ে সবার পিতা। কারণ, আল্লাহ তা'আলা সমগ্র মানব জাতির জন্য ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম-কে তার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরে নেতা হিসাবে মনোনীত করেন। তিনি আনুগত্যের চরম পারাকার্তা দেখিয়েছেন, সুতরাং সমস্ত আনুগত্যকারীদের তিনি পিতা। তাছাড়া ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সম্মান করা তেমনি অবশ্য কর্তব্য যেমনি সন্তান তার পিতার সম্মান করা একান্ত কর্তব্য। কারণ তিনি তাদের নবীর পিতা। [আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস; কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

[৫] আয়াতের অর্থ, তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম-এর মিল্লাতকে আঁকড়ে ধর। [ফাতহুল কাদীর]

আয়াতের অন্য অর্থ হচ্ছে, তোমাদের দ্বীনে তোমাদের জন্য কোন সংকীর্ণতা রাখেন নি, যেমন তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাতে কোন সংকীর্ণতা ছিল না। [তাবারী; ইবন কাসীর]

অপর অর্থ হচ্ছে, পূর্ববর্তী আয়াতে যে নির্দেশগুলো দেয়া হয়েছিল, অর্থাৎ রুকু, সিজদা, কল্যাণমূলক কাজ এবং যথাযথ জিহাদ করা এগুলো ইবরাহীম আলাইহিস সালামের মিল্লাত। তখন আয়াতটির সমর্থন অন্য আয়াতেও এসেছে, “বলুন, ‘আমার রব তো আমাকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন। এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন, ইবরাহীমের

মিল্লাত (আদর্শ), তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।” [সূরা আল-আন’আমঃ ১৬১] কারণ, রুকু, সিজদা, কল্যাণমূলক কাজ, যথাযথ জিহাদ এসবই সুপ্রতিষ্ঠিত ঘ্রীনের অন্তর্ভুক্ত। [আদওয়াউল বায়ান]

[৬] তিনি তোমাদেরকে পূর্বে এবং এ কিতাব কুরআনে মুসলিম নামকরণ করেছেন। এখানে তিনি বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে দু’টি মত রয়েছে- (এক) এখানে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম-কে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামই কুরআনের পূর্বে উম্মতে মুহাম্মদী এবং সমগ্র বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য ‘মুসলিম’ নামকরণ করেছেন; যেমন, ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম-এর এই দো‘আ কুরআনে বর্ণিত আছে: رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا [সূরা আল-বাকারাহঃ ১২৮]-কুরআনে মুমিনদের নামকরণ করা হয়েছে মুসলিম। যদিও এই নামকরণকারী প্রত্যক্ষভাবে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম নন, কিন্তু কুরআনের পূর্বে তার এই নামকরণ কুরআনে মুসলিম নামে অভিহিত করার কারণ হয়েছে। তাই এর সম্বন্ধে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম-এর দিকে করে দেয়া হয়েছে। (দুই) প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হল: এখানে “তিনি” বলে আল্লাহ কে বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহই তোমাদেরকে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে এবং কুরআনে মুসলিম নামে অভিহিত করেছেন। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর] সে হিসেবে এখানে “তোমাদের” সম্বোধনটি শুধুমাত্র এ উম্মতের জন্য নির্দিষ্ট। অর্থাৎ এ উম্মতকেই আল্লাহ তা‘আলা পূর্ববর্তী কিতাব ও এ কিতাবে মুসলিম হিসেবে নামকরণ করেছেন। এটি এ উম্মতের উপর আল্লাহর খাস রহমত ও দয়া। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(৭) অর্থাৎ ওপরে যে খিদমতের কথা বলা হয়েছে সমগ্র মানব জাতির মধ্য থেকে তোমাদেরকে তা সম্পাদন করার জন্য বাছাই করে নেয়া হয়েছে। এ বিষয়বস্তুটি কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এভাবে আমরা তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিতে পরিণত করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির উপর স্বাক্ষী হও এবং রাসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হতে পারেন”। [সূরা আল-বাকারাহঃ ১৪৩] এখানে একথাটিও জানা দরকার যে, সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা যেসব আয়াতের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় এবং যেসব আয়াতের মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে বিদ্রূপ ও দোষারোপকারীদের ত্রাস্তি প্রমাণিত হয় এ আয়াতটি সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত। একথা সুস্পষ্ট যে, এ আয়াতে সরাসরি সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করা হয়েছে, অন্যলোকদের প্রতি সম্বোধন মূলত তাদেরই মাধ্যমে করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে বিভিন্ন হাদীসে বিস্তারিতভাবে এসেছে, যার সারমর্ম হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাশরের ময়দানে সাক্ষ্য দেবেন যে, আমি আল্লাহ তা‘আলার বিধি-বিধান এই উম্মতের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলাম। তখন উম্মতে মুহাম্মদী তা স্বীকার করবে। কিন্তু অন্যান্য নবীগণ যখন এই দাবী করবেন, তখন তাদের উম্মতরা অস্বীকার করে বসবে। তখন উম্মতে মুহাম্মদী সাক্ষ্য দেবে যে, সব নবীগণ নিশ্চিতরূপেই তাদের উম্মতের কাছে আল্লাহ তা‘আলার বিধানাবলী পৌঁছে দিয়েছিলেন। সংশ্লিষ্ট উম্মতের পক্ষ থেকে তাদের এই সাক্ষ্যের উপর জেরা করা হবে যে, আমাদের যামানায় উম্মতে মুহাম্মদীর অস্তিত্বই ছিল না। সুতরাং তারা আমাদের ব্যাপারে কিরূপে সাক্ষ্য হতে পারে? উম্মতে মুহাম্মদীর পক্ষ থেকে জেরার জবাবে বলা হবে: আমরা বিদ্যমান ছিলাম না ঠিকই, কিন্তু আমরা আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুখ থেকে এ কথা শুনেছি, যার সত্যবাদিতায় কোন সন্দেহ নেই।

কাজেই আমরা সাক্ষ্য দিতে পারি। অতঃপর তাদের সাক্ষ্য কবুল করা হবে। এই বিষয়বস্তু বুখারী ইত্যাদি গ্রন্থে আবু সায়ীদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর হাদীসে বর্ণিত আছে। [দেখুন- বুখারী: ৩৩৩৯]

(৮) উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা’আলা যখন তোমাদের প্রতি এতসব বিরাট অনুগ্রহ করেছেন যেগুলো ওপরে বর্ণিত হয়েছে, তখন তোমাদের কর্তব্য আল্লাহর বিধানাবলী পালনে পুরোপুরি সচেষ্টিত হওয়া। বিধানাবলীর মধ্যে এস্থলে শুধু সালাত ও যাকাত উল্লেখ করার কারণ এই যে, দৈহিক কর্ম ও বিধানাবলীর মধ্যে সালাত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং আর্থিক বিধানাবলীর মধ্যে যাকাত সর্বাধিক গুরুত্ববহ; যদিও শরী‘আতের সব বিধান পালন করাই উদ্দেশ্য। মূলকথা হচ্ছে, আল্লাহ যা অবশ্য কর্তব্য করেছেন সেটা সম্পন্ন করা এবং যা হারাম করেছেন সেটা থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে আল্লাহর হুকুম আদায় করা। আর তন্মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, সালাত কামেয় করা, যাকাত দেয়া, আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি ইহসান বা দয়া করা, আল্লাহ ফকীরদের জন্য, দুর্বল ও অভাবীদের জন্য ধনীদের উপর তাদের সম্পদ থেকে বছরে যৎকিঞ্চিৎ যা ফরয করেছেন তা বের করে আদায় করা। [ইবন কাসীর]

(৯) অর্থাৎ মজবুতভাবে আল্লাহকে আঁকড়ে ধরো। পথ নির্দেশনা ও জীবন যাপনের বিধান তাঁর কাছ থেকেই নাও। তাঁরই আনুগত্য করো। তাঁকেই ভয় করো। আশা-আকাংখা তাঁরই সাথে বিজড়িত করো। তাঁরই কাছে হাত পাতো। তাঁরই সত্তার উপর নির্ভর করে তাওয়াক্কুল ও আস্তার বুনিয়ে দাও। তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন: এই বাক্যের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা’আলার কাছে দো‘আ কর- তিনি যেন তোমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের অপছন্দনীয় বিষয়াদি থেকে নিরাপদ রাখেন। কেউ কেউ বলেন: এই বাক্যের অর্থ এই যে, কুরআন ও সুন্নাহকে অবলম্বন কর, সর্বাবস্থায় এগুলোকে আঁকড়ে থাক; যেমন এক হাদীসে আছে- ‘আমি তোমাদের জন্য দু’টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। তোমরা যে পর্যন্ত এ দু’টিকে অবলম্বন করে থাকবে; পথত্রস্ত হবে না। একটি আল্লাহর কিতাব ও অপরটি আমার সুন্নাহ। [মুয়াত্তা ইমাম মালেক: ১৩৯৫]

জিহাদ মানে নিছক রক্তপাত বা যুদ্ধ নয় বরং এ শব্দটি প্রচেষ্টা, সংগ্রাম, দ্বন্দ্ব এবং চূড়ান্ত চেষ্টা চালানো অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আবার জিহাদ ও মুজাহিদের মধ্যে এ অর্থও রয়েছে যে, বাধা দেবার মতো কিছু শক্তি আছে যেগুলোর মোকাবিলায় এই প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম কাম্য। এই সঙ্গে “ফিল্লাহ” (আল্লাহর পথে) শব্দ এ বিষয়টি নির্ধারিত করে দেয় যে, বাধাদানকারী শক্তিগুলো হচ্ছে এমনসব শক্তি যেগুলো আল্লাহর বন্দেগী, তাঁর সন্তুষ্টি লাভ ও তাঁর পথে চলার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের উদ্দেশ্য হয় তাদের বাধা ও প্রতিবন্ধকতাকে প্রতিহত করে মানুষ নিজেও আল্লাহর যথাযথ বন্দেগী করবে এবং দুনিয়াতেও তাঁর কালেমাকে বুলন্দ এবং কুফর ও নাস্তিক্যবাদের কালেমাকে নিম্নগামী করার জন্য প্রাণপাত করবে। মানুষের নিজের “নফসে আন্নারা” তথা বৈষয়িক ভোগলিপ্সু ইন্দ্রিয়ের বিরুদ্ধে এ মুজাহাদা ও প্রচেষ্টার প্রথম অভিযান

পরিচালিত হয়। এ নফসে আশ্মারা সবসময় আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য চাপ প্রয়োগ করতে থাকে এবং মানুষকে ঈমান ও আনুগত্যের পথ থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা চালায়। তাকে নিয়ন্ত্রিত ও বিজিত না করা পর্যন্ত বাইরে কোন প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের সম্ভাবনা নেই। তাই এক যুদ্ধ ফেরত গাজীদেরকে নবী ﷺ বলেন:

قَدْ مَنَّتُمْ خَيْرَ مَقْدَمٍ مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ

“তোমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে এসে গেছো।”

আরো বলেন, *مجاهدة العبد هو* “মানুষের নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম।” এরপর সারা দুনিয়াই হচ্ছে জিহাদের ব্যাপকতর ক্ষেত্র। সেখানে কর্মরত সকল প্রকার বিদ্রোহাঙ্কক, বিদ্রোহোদ্দীপক ও বিদ্রোহোৎপাদক শক্তির বিরুদ্ধে মন, মস্তিষ্ক, শরীর ও সম্পদের সমগ্র শক্তি সহকারে প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালানোই হচ্ছে জিহাদের হক আদায় করা, যার দাবী এখানে করা হচ্ছে।

অর্থাৎ উপরে যে খিদমতের কথা বলা হয়েছে সমগ্র মানবজাতির মধ্য থেকে তোমাদেরকে তা সম্পাদন করার জন্য বাছাই করে নেয়া হয়েছে। এ বিষয়বস্তুটি কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন সূরা বাকারায় বলা হয়েছে: *جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا* (১৪৩ আয়াত) এবং সূরা আলে ইমরানে বলা হয়েছে: *كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ* (১১০ আয়াত) এখানে একথাটিও জানিয়ে দেয়া সঙ্গত মনে করি যে, সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা যেসব আয়াতের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় এবং যেসব আয়াতের মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে বিদ্রূপ ও দোষারোপকারীদের ভ্রান্তি প্রমাণিত হয় এ আয়াতটি সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত। একথা সুস্পষ্ট যে, এ আয়াতে সরাসরি সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করা হয়েছে, অন্য লোকদের প্রতি সম্বোধন মূলত তাঁদেরই মাধ্যমে করা হয়েছে।

অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতদের ফকীহ, ফরিশী ও পাদরীরা তাদের ওপর যেসব অপ্রয়োজনীয় ও অযথা নীতি-নিয়ম চাপিয়ে দিয়েছিল সেগুলো থেকে তোমাদেরকে মুক্ত করে দিয়েছেন। এখানে চিন্তা-গবেষণার ওপর এমন কোন বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয়নি যা তাত্ত্বিক উন্নয়নে বাধার সৃষ্টি করতে পারে। আবার বাস্তব কর্মজীবনেও এমন বিধি-নিষেধের পাহাড় দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়নি যা সমাজ ও সংস্কৃতির উন্নয়নের পথ রুদ্ধ করে দেয়। তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে একটি সহজ-সরল বিশ্বাস ও আইন। এ নিয়ে তোমরা যতদূর এগিয়ে যেতে চাও এগিয়ে যেতে পারো। এখানে যে বিষয়বস্তুটিকে ইতিবাচক ভংগীতে বর্ণনা করা হয়েছে সেটি আবার অন্যত্র উপস্থাপিত হয়েছে নেতিবাচক ভংগীতে। যেমন-

يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

“এ রসূল তাদেরকে পরিচিত সংকাজের হুকুম দেয় এবং এমন সব অসংকাজ করতে তাদেরকে নিষেধ করেন যেগুলো করতে মানবিক প্রকৃতি অস্বীকার করে আর এমন সব জিনিস তাদের জন্য হালাল করে যেগুলো পাক-পবিত্র এবং এমন সব জিনিস হারাম করে যেগুলো নাপাক ও অপবিত্র। আর তাদের ওপর থেকে এমন ভারী বোঝা নামিয়ে দেয়, যা তাদের ওপর চাপানো ছিল এবং এমন সব শৃংখল থেকে তাদেরকে মুক্ত করে যেগুলোয় তারা আটকে ছিল।” (আ’রাফঃ:১৫৭)

যদিও ইসলামকে ইবরাহীমের মিল্লাতের ন্যায় নূহের মিল্লাত, মূসার মিল্লাত ও ঈসার মিল্লাত বলা যেতে পারে কিন্তু কুরআন মজীদে বার বার একে ইবরাহীমের মিল্লাত বলে তিনটি কারণে এর অনুসরণ করার দাওয়াত দেয়া হয়েছে। এক, কুরআনের বক্তব্যের প্রথম লক্ষ্য ছিল আরবরা, আর তারা ইবরাহীমের সাথে যেভাবে পরিচিত ছিল তেমনটি আর কারো সাথে ছিল না। তাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও আকীদা-বিশ্বাসে যার ব্যক্তিত্বের প্রভাব সর্বব্যাপী ছিল তিনি ছিলেন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম। দুই, হযরত ইবরাহীমই এমন এক ব্যক্তি ছিলেন যাঁর উন্নত চরিত্রের ব্যাপারে ইহুদী, খৃস্টান, মুসলমান, আরবীয় মুশরিক ও মধ্যপ্রাচ্যের সাবায়ী তথা নক্ষত্র পূজারীরা সবাই একমত ছিল। নবীদের মধ্যে দ্বিতীয় এমন কেউ ছিলেন না এবং নেই যার ব্যাপারে সবাই একমত হতে পারে। তিন, হযরত ইবরাহীম এসব মিল্লাতের জন্মের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছেন। ইহুদীবাদ, খৃস্টবাদ ও সাবায়বাদ সম্পর্কে তো সবই জানে যে, এগুলো পরবর্তীকালে উদ্ভাবিত হয়েছে আর আরবীয় মুশরিকদের ব্যাপারে বলা যায়, তারা নিজেরাও একথা স্বীকার করতো যে, তাদের সমাজে মূর্তি পূজা শুরু হয় আমরা ইবনে লুহাই থেকে। সে ছিল বনী খুযা’আর সরদার। মা’আব (মাওয়াব) এলাকা থেকে সে ‘হবুল’ নামক মূর্তি নিয়ে এসেছিল। তার সময়টা ছিল বড় জোর ঈসা আলাইহিস সালামের পাঁচ-ছ’শ বছর আগের। কাজেই এ মিল্লাতটিও হযরত ইবরাহীমের শত শত বছর পরে তৈরি হয়েছে। এ অবস্থায় কুরআন যখন বলে এ মিল্লাতগুলোর পরিবর্তে ইবরাহীমের মিল্লাত গ্রহণ করো তখন সে আসলে এ সত্যটি জানিয়ে দেয় যে, যদি হযরত ইবরাহীম সত্য ও হিদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে থাকেন এবং এ মিল্লাতগুলোর মধ্য থেকে কোনটিরই অনুসারী না থেকে থাকেন তাহলে নিশ্চিতভাবেই তাঁর মিল্লাতই প্রকৃত সত্য মিল্লাত। পরবর্তীকালের মিল্লাতগুলো সত্য নয়। আর মুহাম্মাদ ﷺ এ মিল্লাতের দিকেই দাওয়াত দিচ্ছে।

“তোমাদের” সন্োধনটি শুধুমাত্র এ আয়াতটি নামিল হবার সময় যেসব লোক ঈমান এনেছিল অথবা তারপর ঈমানদারদের দলভুক্ত হয়েছিল তাদের উদ্দেশ্যে করা হয়নি বরং মানব ইতিহাসের সূচনালগ্ন থেকেই যারা তাওহীদ, আখেরাত, রিসালাত ও আসমানী কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী দলভুক্ত থেকেছে তাদের সবাইকেই এখানে সন্োধন করা হয়েছে। এখানে মূল বক্তব্য হচ্ছে, এ সত্য মিল্লাতের অনুসারীদেরকে কোনদিন “নূহী” “ইবরাহীমী”, “মূসাভী” বা “মসীহী” ইত্যাদি বলা হয়নি বরং তাদের নাম “মুসলিম (আল্লাহর ফরমানের অনুগত) ছিল এবং আজো তারা “মুহাম্মাদী” নয় বরং মুসলিম। একথাটি না বুঝার কারণে লোকদের জন্য

এ প্রশ্নটি একটি ধাঁধার সৃষ্টি করে রেখেছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীদেরকে কুরআনের পূর্বে কোন্ কিতাবে মুসলিম নামে আখ্যায়িত করা হয়েছিল?

অথবা অন্য কথায় মজবুতভাবে আল্লাহকে আঁকড়ে ধরো। পথনির্দেশনা ও জীবন যাপনের বিধান তাঁর কাছ থেকেই নাও। তাঁরই আনুগত্য করো। তাঁকেই ভয় করো। আশা-আকাংখা তাঁরই সাথে বিজড়িত করো। সাহায্যের জন্য তাঁরই কাছে হাত পাতো। তাঁরই সত্তার ওপর নির্ভর করে তাওয়াক্কুল ও আস্থার বুনিয়াদ গড়ে তোলো।

(وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ)

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে এ নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন আল্লাহ তা'আলার পথে সংগ্রাম করে। এ 'সংগ্রাম' বলতে কেউ কেউ সেই বড় জিহাদ উদ্দেশ্য নিয়েছেন যা আল্লাহ তা'আলার কালিমা ও দীনকে উন্নত করার জন্য কাফির ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে করা হয়। আবার কেউ কেউ আদেশাবলী মান্য করার অর্থ নিয়েছেন। যেহেতু তাতেও নাফসে আশ্চারাহ (মন্দপ্রবণ মন) ও শয়তানের মুকাবিলা করতে হয়। আবার কেউ কেউ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তা হল প্রত্যেক সেই চেষ্টা-সাধনা যা হক ও সত্যের শির উন্নত এবং বাতিল ও অন্যায়ের শির অবনত করার জন্য করা হয়।

মূলত জিহাদ হল, উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য প্রাণান্তর চেষ্টা করা। আর আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদ বলতে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশকে পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করা, আল্লাহ তা'আলার পথে মানুষকে দাওয়াত দেয়ান সেটা হতে পারে উপদেশ, শিক্ষা, যুদ্ধ, শিষ্টাচার, ধমক এবং নসীহত ইত্যাদির মাধ্যমে। (তাকসীর সাদী)

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন: তিনি মানব জাতির জন্য যে দীন বা ধর্ম নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাতে কঠিন কোন কিছু নেই। অর্থাৎ ইসলাম ধর্মে এমন আদেশ নেই, যা মান্য করা অত্যন্ত কষ্টকর। বরং পূর্ববর্তী শরীয়তের কিছু কঠিন আদেশ রহিত করে দেয়া হয়েছে এবং মুসলিমদের জন্য এমন অনেক সহজতা দান করা হয়েছে যা পূর্ববর্তী শরীয়তে ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: নিশ্চয়ই দীন সহজ, দীনের ব্যাপারে কেউ কঠোরতা করলে দীন তার ওপর বিজয়ী হবে। (সহীহ বুখারী হা: ৩৯)

(مَلَّةً أَيْبَيْتُكُمْ إِذْ رَاهِبِيْمَ طَهُوْرَ سَمَّكُمْ الْمُسْلِمِيْنَ)

‘এটাই তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্ম। তিনি পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন ‘মুসলিম’ অর্থাৎ উল্লিখিত নির্দেশাবলী তোমাদের জাতির পিতা ইবরাহীম (عليه السلام)–এর ধর্মের অন্তর্ভুক্ত, যা সর্বদা বহাল ছিল। সুতরাং তোমরা তাঁর মিল্লাত তথা ধর্মকে আঁকড়ে ধরে থাক। এখানে ইবরাহীম (عليه السلام)–কে পিতা বলার কারণ হল, আরব জাতি ইসমাঈল (عليه السلام)–এর বংশধর ছিল। সেই হিসেবে ইবরাহীম (عليه السلام) হলেন আরববাসীর পিতা আর অনারবরাও তাঁকে একজন উচ্চ সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে শ্রদ্ধা করত, যেমন পুত্র তার পিতাকে শ্রদ্ধা করে থাকে। সেই হিসেবে তিনি সকলের আদি পিতা ছিলেন। এছাড়াও ইসলামের নাবী আরবী হওয়ার কারণে ইবরাহীম (عليه السلام) তাঁরও পিতা ছিলেন। আর এ জন্য তিনি সকল উম্মাতে মুহাম্মাদীরও পিতা হলেন। আর তিনিই তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম বলে। এখানে هُوَ তিনিই বলতে কাকে বুঝানো হয়েছে? কেউ বলেছেন, ইবরাহীম (عليه السلام); কেউ বলেছেন, কুরআন; আবার কেউ বলেছেন আল্লাহ তা‘আলা। مِنْ قَدِيلٍ অর্থাৎ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে, আর وَفِي هَذَا দ্বারা কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

(رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ)

“হে আমাদের রব! আমাদের উভয়কে আপনার অনুগত করুন এবং আমাদের বংশধরদের মধ্য হতেও আপনার অনুগত একদল লোক সৃষ্টি করুন।” (সূরা বাক্বারাহ ২:১২৮)

অতএব তোমরা তাঁরই ধর্মের অনুসারী হও। কেননা তাঁর ধর্মই হল সঠিক ধর্ম। আল্লাহ বলেন:

(ط دِيْنًا قَبِيْمًا مِّلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيفًا ج وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ ە قُلْ اِنِّي هَدَانِي رَبِّيْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ)

“বল: নিশ্চয়ই ‘আমার প্রতিপালক আমাকে সৎ পথে পরিচালিত করেছেন, তা সুপ্রতিষ্ঠিত দীন, ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ, তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।” (সূরা আন‘আম ৬:১৬১)

(لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيدًا عَلَيْنَكُمْ وَتَكُوْنُوْا شَهِدَاءَ عَلَي النَّاسِ)

অত্র আয়াতে উম্মাতে মুহাম্মাদীর মর্যাদার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমাদের ভাল-মন্দ আমলের সাক্ষী হবেন আর তোমরা (উম্মাতে মুহাম্মাদী) হবে সমগ্র মানব জাতির ওপর সাক্ষী। কারণ তোমরা মধ্যমপন্থী জাতি, যাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এ সম্পর্কে সূরা বাক্বারার ১৪৩ নং আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

(وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ)

‘আল্লাহকে আঁকড়ে ধর’ বলতে আল্লাহ তা‘আলার রজুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধর। তাঁর ওপর পূর্ণ ভরসা রাখ, তোমাদের সমস্ত কাজে তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর। সব সময় তাঁর ওপরই নির্ভর কর। তাঁরই সাহায্য-সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতার প্রতি দৃষ্টি রাখ।

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. মু‘মিনদের সফলতার অন্যতম চাবিকাঠি হল সালাত আদায় করা।
২. উম্মাতে মুহাম্মাদীর মর্যাদা সম্পর্কে জানলাম।
৩. সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা‘আলার রজুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে হবে।
৪. মুসলিমদের জাতির পিতা হলেন ইবরাহীম (عليه السلام)।
৫. মু‘মিনদের অভিভাবক হলেন আল্লাহ তা‘আলা।

সূরা: আত-তওবা

আয়াত নং :-১২৩

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غُلُظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

হে ঈমানদারগণ! সত্য অস্বীকারকারীদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী তাদের সাথে যুদ্ধ করো। তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়। জেনে রাখো আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।

১২৩ নং আয়াতের তাফসীর:

[১] এ আয়াতসমূহে কোন নিয়মে কাফেরদের সাথে জিহাদ করা হবে তা জানিয়ে দেয়া হচ্ছে, আয়াতে বলা হচ্ছে যে, কাফেরদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী, প্রথমে তাদের সাথে জিহাদ করবে। এখানে নিকট বলে নিকটবর্তী অবস্থান ও নিকট সম্পর্ক এ দু’রকমের হতে পারে। [বাগতী]

(এক) অবস্থানের দিক দিয়ে অর্থাৎ যারা তোমাদের নিকটে অবস্থানকারী, প্রথমে তাদের সাথে জিহাদ কর।
[ইবন কাসীর]

(দুই) গোত্র, আত্মীয়তা ও সম্পর্কের দিক দিয়ে যারা নিকটবর্তী অন্যান্যদের আগে তাদের সাথে জিহাদ চালিয়ে
যাও [বাগভী]

যেমন, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদেশ দিয়ে বলেন: “হে রাসূল, নিজের
নিকটআত্মীয়গণকে আল্লাহর আযাবের ভয়প্রদর্শন করুন।” [সূরা আশ-শু'আরা: ২১৪]

তাই তিনি এ আদেশ পালনে সর্বাগ্রে স্বগোত্রীয়দের সমবেত করে আল্লাহর বাণী শুনিয়ে দেন। অনুরূপ, তিনি
স্থান হিসাবে প্রথমে মদীনার আশ-পাশের কাফের তথা -বনু— কোরাইয়া, বনু— নদীর ও খায়বরবাসীদের
সাথে বুঝাপড়া করেন। তারপর পূর্ববর্তী লোকদের সাথে জিহাদ করেন এবং সবশেষে রোমানদের সাথে
জিহাদের আদেশ আসে, যার ফলে তাবুক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। [ইবন কাসীর]

[২] (غظة) শব্দের অর্থ: কঠোরতা [ফাতহুল কাদীর, ইবন কাসীর]

কারণ, প্রকৃত মুমিন সেই ব্যক্তি যে, ঈমানদারদের সাথে নরম ব্যবহার করে, আর কাফেরদের সাথে থাকে
কঠোর [ইবন কাসীর]

সুতরাং তাদের সাথে এমন ব্যবহার কর, যাতে তোমাদের কোন দুর্বলতা তাদের চোখে ধরা না পড়ে। অন্য
আয়াতেও আল্লাহ তা'আলা এ নির্দেশটি দিয়েছেন। তিনি বলেন, “হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ দ্বীন
থেকে ফিরে গেলে নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় আনবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং যারা তাঁকে
ভালবাসবে; তারা মুমিনদের প্রতি কোমল ও কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে” [সূরা আল-মায়দাহ ৫৪]

আরও বলেন, “মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল; তার সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের
প্রতি সহানুভূতিশীল” [সূরা আল-ফাতহ: ২৯]

আরও বলেন, “হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন ”
[সূরা আত-তাওবাহ: ৭৩. আততাহরীম: ৯]

মূল আয়াতে যে শব্দ সংযোজিত হয়েছে তার বাহ্যিক অর্থ হচ্ছে, দারুল ইসলামের যে অংশ ইসলামের শত্রুদের এলাকার যে অংশের সাথে মিশে আছে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রাথমিক দায়িত্ব ঐ অংশের মুসলমানদের ওপর আরোপিত। কিন্তু পরে যা বলা হয়েছে তার সাথে-এ আয়াতটিকে মিলিয়ে পড়লে জানা যাবে, এখানে কাফের বলতে এমন সব মুনাফিককে বুঝানো হয়েছে যাদের সত্য অস্বীকার করার বিষয়টি পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে সামনে এসে গিয়েছিল এবং যাদের ইসলামী সমাজের মধ্যে মিশে একাকার হয়ে থাকার কারণে মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছিল। ১০ রুকূর শুরুতেও এ ভাষণটি আরম্ভ করার সময় প্রথম কথার সূচনা এভাবেই করা হয়েছিল: এবার এ ঘরের শত্রুদের প্রতিহত করার জন্য যথারীতি জিহাদ শুরু করে দিতে হবে। এখানে ভাষণ শেষ করার সময় তাকীদ সহকারে সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এভাবে মুসলমানরা এর গুরুত্ব অনুধাবন করবে। যে আত্মীয়তা এবং বংশগত ও সামাজিক সম্পর্কের কারণে তারা মুনাফিকদের সাথে সম্পর্ক জুড়ে ছিল এরপর আর তারা তাদের সাথে ঐ সম্পর্কের পরোয়া করবে না। সেখানে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার হুকুম দেয়া হয়েছিল। আর এখানে তার চেয়ে কড়া “কিতাল” শব্দ (সশস্ত্র যুদ্ধ করে হত্যা করা) ব্যবহার করা হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, তাদেরকে পুরোপুরি উৎখাত করে দও, তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করার ব্যাপারে যেন কোন প্রকার ভ্রুটি না থাকে। সেখানে কাফের ও মুনাফিক দুটো আলাদা শব্দ বলা হয়েছিল। আর এখানে শুধুমাত্র কাফের শব্দের ওপরই নির্ভর করা হয়েছে। কারণ তাদের সত্য অস্বীকৃতি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছিল। কাজেই ঈমানের বাহ্যিক স্বীকৃতির অন্তরালে আত্মগোপন করে তা যেকোন প্রকার সুবিধা আদায় করতে না পারে একথাটি ব্যক্ত করাই এর উদ্দেশ্য।

অর্থাৎ এ পর্যন্ত তাদের সাথে যে নরম ব্যবহার করা হয়েছে তার এখন পরিসমাপ্তি হওয়া উচিত। দশ রুকূর শুরুতে একথাটিই বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে غُلَّتْ عَلَيْهِمْ তাদের সাথে কঠোর ব্যবহার করো।

এ সতর্ক বাণীর দু’টি অর্থ হয়। দুটো অর্থই এখানে সমানভাবে প্রযোজ্য। এক, এ সত্য অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে যদি তোমরা নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের পরোয়া করো তাহলে এটা হবে তাকওয়া বিরোধী। কারণ মুতাকী হওয়া এবং আল্লাহর দুশমনদের সাথে মানসিক সম্পর্ক রাখা-এ দুটো বিষয় পরস্পর বিরোধী। কাজেই আল্লাহর সাহায্য পেতে হলে এ ধরনের সম্পর্ক থেকে দূরে থাকতে হবে। দুই, এ কঠোরতা ও যুদ্ধ করার যে হুকুম দেয়া হচ্ছে, এর অর্থ এ নয় যে, তাদের প্রতি কঠোর হবার ব্যাপারে নৈতিকতা ও মানবিকতার সমস্ত সীমারেখা ভেঙ্গে ফেলতে হবে। সমস্ত কাজে আল্লাহর নির্ধারিতই সীমারেখা অটুট রাখার দায়িত্ব অবশ্যই মানুষের ওপর বর্তায়। মানুষ যদি তা পরিত্যাগ করে তাহলে তার অর্থ দাঁড়াবে, আল্লাহও তাকে পরিত্যাগ করবে।

এ আয়াতে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার এক গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে। তা হল, কাফিরদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী প্রথমে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে। যেমন নাবী (সাঃ) প্রথমে আরব উপদ্বীপে বসবাসকারী মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন করেছেন যারা তাঁর নিকটতম লোক ছিলেন।

(وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غُلْظَةً)

‘তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়’ অর্থাৎ কাফিররা যেন তোমাদের মনকে কঠোর পায়। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

(مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ)

“মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। যারা তাঁর সাথে আছে তারা কাফিরদের ওপর কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে সহানুভূতিশীল, কোমল।” (সূরা ফাতহ ৪৮:২৯)

অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

(أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ)

“তারা মু‘মিনদের প্রতি কোমল ও কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে।” (সূরা মায়িদাহ ৫:৫৪)

সুতরাং মু‘মিনরা কাফিরদের বিরুদ্ধে কঠোর হবে। তাদের রীতি-নীতি বর্জনে এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদে কোনক্রমেই তাদের প্রতি নরম মনোভাব দেখানো যাবে না।

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. আল্লাহ তা‘আলার দীন প্রতিষ্ঠা ও ফেতনা দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত জিহাদ করা ওয়াজিব।
২. নিকটবর্তী কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করা শরীয়তের নির্দেশ।

৩. আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাহায্য দ্বারা মু'মিন-মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।